তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছড়া-কবিতা-গান

সৃষ্টিধর্মী মননের বহিঃপ্রকাশের নির্ভেজাল মাধ্যম ছড়া-কবিতা-গান। মালদহের টাঙন অববাহিকায় ছড়া, কবিতা ও গান শুধু লেখাই হয় না, মানের দিক থেকেও এগুলি যথেষ্ট প্রশংসার দাবিদার। বিষয়টিকে দুটি বিভাজনে আলোচনা করা যাক।

১) ছড়া-কবিতা :

টাঙন অববাহিকা অঞ্চলে কবি ও ছড়াকারের ছড়াছড়ি। এখানকার এমন কোনও জনপদ নেই যেখানে একজনও কখনও ছড়া-কবিতা লেখেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সব ছড়া-কবিতা প্রকাশিত হয়। তবে বেশির ভাগ লেখারই মুদ্রণসৌভাগ্য জোটে না। রাশি রাশি পাণ্ডুলিপির মধ্যে এই সব ছড়া-কবিতা মুখ লুকিয়ে থাকে। সাহিত্যের আসরে কোনও কোনও কবি দু-একটা ছড়া-কবিতা লেখার সুযোগ পান। অনেকে বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারের লোককে শুনিয়েই আত্মতৃপ্তি লাভ করেন।

লেখার প্রাচুর্যের নিরিখে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি নয়। গাজোলের জামতলার রফিকুল হক দুটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মানুষ এবং মানুষ' ১৯৯৬ এ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ৩৩টি কবিতা সংকলিত হয়েছে।

প্রথম কবিতা 'মানুষ' -এ তিনি জাতিভেদহীন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন।— "হিন্দুও নই, মুসলিমও নই / কিংবা কোনও বন্য; / মানবকুলে জন্মেছি যে / মানুষ হবার জন্য।"

'আমরা কিন্তু এখনও' কবিতায় "তরকারি বিহীন ভাতের উৎসবে" যোগ-দেওয়া দারিদ্র্যসংকুল পারিবারিক চিত্র ফুটে উঠেছে। সফদর হাসমির মৃত্যুতে লেখা 'মঞ্চ থেকে মিছিলে' কবিতায় দুনিয়া-কাঁপানো মিছিলের প্রত্যাশা করেছেন কবি।

'আমার জীবন পুড়ে যায়' রফিকুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। ছোটো পরিসরের ৪৪টি কবিতা আছে এতে। ২০০৮-এ কাব্যটি প্রকাশিত হয়। কবির অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর ভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে কয়েকটি কবিতায়। এমনই এক কবিতা 'অনাশ্রয়'—

"চারিদিকে পাগল বৃষ্টি, বিপন্ন সময়;
আচ্ছন্ন প্রেক্ষাপটে
নিটোল নির্মাণ ভেজে
আমার শরীর ভেজে তীব্র অনাশ্রয়ে!"

টুকরো টুকরো ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'একমুঠো গভীরতা', 'খোলাচিঠি', 'জেগে আছি রৌদ্র গন্ধ মেঘে', 'খবর', 'যেন বঙ্গোপসাগর' প্রভৃতি কবিতায়। 'লেখা বা না লেখা' কবিতায় তিনি উপলব্ধি করেছেন — "লেখা বা

না লেখা দুটোই সমান / কখনও না লিখতে পেরে কাঁদে আসমান।” ‘মৃত্যুবরণ’ কবিতায় তিনি জেনেছেন — “মরতে না চাইলে, মানুষ সহজে মরে না।” ‘ভালোবাসা এত কম’ কবিতায় তিনি প্রশ্ন তুলেছেন — “এত কম ভালোবাসায় কি ভালো থাকা যায়?” গ্রন্থ-শিরোনামের কবিতা ‘আমার জীবন পুড়ে যায়’ তাঁর লেখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। বেকারত্বের জ্বালায় “কবিতাও ছাই হয়ে যায়।” এই যন্ত্রণায় কবি “বরিন্দের ঢেলা হয়ে ক্রমশ একটি এঁদো কুয়োর গভীরতর গর্তে” সেঁদিয়ে যাচ্ছেন। কবিতাটির শেষ স্তবকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি তির্যক ভঙ্গিতে হতাশার বিষোদ্গার করেছেন —

“আর, বেকারত্ব-সকারত্ব যেহেতু সরকারনির্ভর
সেহেতু সরকার চায় বিশ্বস্ত চাকর।
শাসন-শোষণ আদি
অব্যাহত রাখতে — তাকে দরকার,
উদ্ভাবনী বুদ্ধিহীন, প্রশ্নহীন আনুগত্য যার।”

দুটি কাব্যেই রফিকুলের শব্দচয়ন, ছন্দ অলংকার নির্মাণ ও উপস্থাপন-শৈলীতে যত্নের ছাপ সুস্পষ্ট।

গাজোলের বেতপুকুরের অনল বর্মন দুটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘বিষাদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে’ ২ আগস্ট ১৯৯৮-এ প্রকাশিত হয়। ২৩টি কবিতার সুসংবদ্ধ সংকলন। কবিতাগুলিতে ব্যক্তিগত ভাবনার উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নময় কল্পনার মূর্ত অবয়ব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রথম কবিতা ‘বিষাদকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে’-তে কবি জানান —

"আমার স্বপ্নের সৃষ্টিরা কল্পলোকে ভেসে বেড়ায়
আমি কল্পনাতেই তাদের স্বাগত জানাই,
বাস্তবতার অজুহাতে
তারা স্বীকৃতি পায় না।"

অনলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অনুসূয়া' ১৯০৫ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রথম কবিতার নামও 'অনুসূয়া'। প্রথম চারটি চরণেই কবির রোমান্টিকতা ব্যক্ত হয়েছে —

"অনুসূয়া, মধ্য রাতের গাঢ় অন্ধকারে
ব্যোমের সুবিশাল শয্যায় শায়িত নক্ষত্রপুঞ্জের মতো
আমিও শুয়ে শুয়ে জেগে থাকি, আর
তোমার সাথেই গল্প করি অভিন্ন অন্তরঙ্গতায়।"

পেশায় দিনমজুর অনলবাবু দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছেন —

"দারিদ্র্যের ছোঁয়া
নিষ্প্রভ করেনি আমাকে,
করেছে মহানুভব।" (দারিদ্র্য-ছোঁয়া)

অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করে 'অঙ্গীকার' কবিতায় তিনি লিখছেন —

"দু'বেলা দু'মুঠো পাইনি খেতে
রক্ত করেছি জল,

তাই ঝিনুকের মুক্তা-খোঁজে
পাবই সাগরতল।"

ছন্দ-অলংকার, শব্দচয়ন ও উপস্থাপনার নিরিখে অনলবাবুর দ্বিতীয় কাব্যটি উৎকৃষ্ট।

বামনগোলার পাকুয়াহাটের অনুকূল বিশ্বাস একটি কাব্যগ্রন্থ ও একটি ছড়ার গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। 'ভুলতে পারি কই' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে শিরোনামবিহীন ৭১টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। ১ অক্টোবর ২০০৯-এ কাব্যটির প্রকাশ। সব কয়টি কবিতাতে চরণান্তিক মিল আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই পর্বের মাত্রা সংখ্যার সাযুজ্য রক্ষিত হয়নি। ছন্দপতন ঘটেছে। কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই ছড়াধর্মী। পাখিকে উপমিত করে তাঁর কয়েকটি কবিতা গ্রন্থটিতে ঠাঁই পেয়েছে। ৪৭-সংখ্যক কবিতায় তিনি লিখেছেন —

"সেই পাখিটা থেকে থেকে
বলতো আমায় ডেকে ডেকে
তুমি ভালো থেকো,
মনে পড়লে আমার কথা
খুলো তোমার স্মৃতির পাতা
মনে মনে দেখো।"

৬১-সংখ্যক কবিতায় কবি পাখির কাছে জানতে চান —

"ওরে পাখি আমার কথা
শুনতে কি আর পাস,

তুইও কি আজ আমার মতো
বিরহের গান গাস?"

অনুকূল বিশ্বাসের ছড়া সংকলন টক-ঝাল-মিষ্টি ২০০৯-এর মালদহ বই মেলায় প্রকাশিত হয়। শিরোনাম-বিহীন ২৯৫টি ছড়া এতে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৯৩টি ছড়াই চার পংক্তির। অনেকটা হাইকুর মতো। বাকি দুটিতে ৬টি করে পংক্তি। ১৪৪-সংখ্যক ছড়ায় দেশের আইনের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে —

"বিড়ি বেচতে দোষ নেই
ধূমপানে দোষ,
কানা আইন দেখে বড়
হয় আপশোষ।"

১৫১-সংখ্যক ছড়াতে রাজনৈতিক নেতার প্রতি ব্যঙ্গ করে বলেছেন —

"শিক্ষায় যদি অগ্রগতি
নেতার মনে ব্যথা,
শিখলে সবাই লেখাপড়া
চামচে পাব কোথা।"

অনুকূলবাবুর ছড়াগুলিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাম্প্রতিক বিষয় উঠে এসেছে। শিশুদের পাঠ্যপুস্তক 'সাহিত্য প্রবেশ'-এর রচয়িতা তিনি।

গাজোলের নিজগ্রামের প্রদীপকুমার দাস 'সাত রঙ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লিখে ৯ মে ২০০৭-এ প্রকাশ করেছেন। ব্যতিক্রমী হাড়ের রোগে আক্রান্ত প্রদীপবাবু পঙ্গু হয়ে অনেক বছর ধরেই শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় থেকেও তিনি ১৮টি কবিতার সংকলন পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। কবিতাগুলি মধ্যম মানের। কোনওটি বর্ণনাধর্মী, আবার কোনওটি ছড়াধর্মী। 'নেশার ফল' কবিতায় নেশার ক্ষতিকারক দিক নিয়ে সতর্ক করেছেন তিনি —

"তামাক নেশা বাজে নেশা
নিকোটিনে তার ভরা,
মুখের ক্যান্সার হতে পারে
ফলটা জীবন হারা।"

'শিশুর আহ্বান', 'জয়', 'ভোলা', 'হারিয়ে যাবে', 'আজব দেশ', 'উপদেশ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা। ছন্দ সম্পর্কে কবি সচেতন। প্রত্যেকটি কবিতাই অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত।

গাজোলের বেতপুকুরের স্বদেশ বর্মন ছড়াকার হিসেবেই খ্যত। ছন্দ সম্পর্কে তিনি অতি সচেতন। কোনও কোনও ছড়ায় পল্লীকবি জসীমুদ্দিনের প্রভাব আছে। তাঁর লেখা ছয়টি বই ও দুটি ছড়াপত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'জীবননদীর ধারে', 'মেঠো পথের বাঁকে', 'বরিন্দভূমির ছবি', 'দেশ ও দশের হালচাল', 'শহিদ স্মরণে' ও 'সমাজ গড়ার রূপকার' তাঁর ছড়াগ্রন্থ।

'মেঠোপথের বাঁকে' গ্রন্থের 'নতুন বছর' ছড়ায় বিয়োগান্তক সুর ধ্বনিত হয়েছে—

"সুতো কাটা ঘুড়ির মতন বছর যায় যে উড়ে
জীবন চলার লাটাই ছিঁড়ে কোথায় বহু দূরে।
....
হঠাৎ যেন খবর আসে বছর নাকি শেষ-
জীবন পাতায় দিনলিপির আঁকড়ে থাকে রেশ।"

তাঁর দ্বিতীয় ছড়াপত্র (১ ডিসেম্বর ২০০৯-এ প্রকাশিত) -এর 'সমাজের হালচাল' ছড়ায় লিখেছেন —

"নতুন যুগের বইছে হাওয়া খাচ্ছে সমাজটাকে
কোলের শিশু আই লাভ ইউ বলছে বাবা-মাকে।
....
মায়ে-ছায়ে দেখছে ছবি প্রেম নিবেদন রস
শিশুর মনে মারছে ছোবল তাকেও করছে বশ।"

বামনগোলার মদনাবতীর স্বপনকুমার চক্রবর্তী 'কেরি স্মৃতি' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন ২৬ জানুয়ারি ২০০৬-এ। মদনাবতীতে কেরির অবস্থান প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্য এই কবিতাটিতে আছে।

'সজাগ' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ রুদ্র, বিট্টু ও রাতুল নামে তিন জীবনমুখী কবি প্রকাশ করেছেন, রুদ্রের পাঁচটি কবিতা, বিট্টুর তিনটি কবিতা ও রাতুলের চারটি কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। 'সেই ছেলেটি' কবিতায় রুদ্রের

হতাশাবোধ ব্যক্ত হয়েছে। ‘সময়’ কবিতায় সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জীবনপথ চলতে ব্যর্থ হয়েছেন বিট্টু। ‘পৃথিবী’ কবিতায় রাতুলের পরিবেশচেতনা প্রকাশ পেয়েছে।

গাজোলের ময়না গ্রামের মজিবর রহমান আঞ্চলিক ভাষায় ভালো মানের কবিতা লেখেন। ‘ফুরসত কুণ্ঠিনা পাবু’[১] কবিতায় তাঁর ভাবনাবিন্যাস —

“তমরা কহছেন —
পেথিবীটা নাকি মস্ত বড়;
মোর ত মনে হয় না বাপু,
দিন দিন অর হাড়-পাঞ্জরলা
ভাঙ্গি যাচ্ছে —
একটা পটলা হই যাছে পেথিবীটা।”

গাজোলের রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বছর ধরে কবিতা লেখেন। গদ্যধর্মী কবিতার সংখ্যাই বেশি। তাঁর লেখা সাম্প্রতিক একটি কবিতার অংশ—

“হিংসাকে ঢুকিয়ে রেখেছি আস্তিনে
হিংসাকে ঢুকিয়ে রেখেছি বুকের খাঁচায়
অন্যের আবাদি ক্ষেতে
সবুজের ঢল দেখলে
বাতাসে ফেলতে থাকি হিংসার নিঃশ্বাস!”

(হিংসা)[২]

অনিমেষ দাস গাজোলের তারাতলার কবি। রাজনীতি ও সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন। তাঁর 'বাংলা ভাষা'[৩] কবিতার শেষ স্তবকে ভাষাপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

"সাজাচ্ছি তাই মাঠটি বিজন
মিষ্টি-খাসা স্বপ্নে ভাসা
ইচ্ছে মতন করছি সৃজন
বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা !!"

বামনগোলার হরিচরণ শিকদার মণ্ডল গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন। বেশ পাকা হাত তাঁর। তাঁর 'কান্না বিষয়ক'[৪] কবিতার কয়েকটি পংক্তি —

"কান্নার কোন নাদ নেই দ্রোহ নেই নদীর জলে
দুঃখের মান্দাসা ভাসালেও কালিক দু'চোখে
চিহ্ন মাত্র শোকের ঢেউ থাকে না;
কান্না বলে, আমাকে অঝোরধারা দাও,
চোখ বলে ধুইয়ে দাও দুঃখের কাজল।"

হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডের কবিতা যথেষ্ট পরিণত। তাঁর 'আলোবাজি'[৫] কবিতার প্রথম চারটি ছত্র এখানে উদ্ধার করা হল —

"আড়ম্বর এসেছো সাজিয়ে তোল তবে আমার পূর্ণাহুতি
দস্তুর মতো আগুনে ঢেলে নাভিকুণ্ড পতন

বিষণ্ন আলোয় দীর্ঘকায় জন্ম জেগে উঠুক'
বিদ্রোহী ছায়ার সাথে তোমার নৈঃশব্দ ঘিরে মাতাও রোদ্দুর।"

পাকুয়াহাটের পরেশ মণ্ডল লোকায়ত শব্দচয়নে কবিতার বাঁধন দৃঢ় করেন। 'পিদ্দুম জ্বালা'[৬] কবিতার প্রথম চারটি চরণ —

"এই ভর দোপরে
এত আন্ধার ক্যা,
পিদ্দুম জ্বালা
পিদ্দুম জ্বালা ময়না!"

বামনগোলার থিনগরের দেবেন্দ্রনাথ বর্মনকে লোককবি বলা হয়। তাঁর 'বজ্রশূল'[৭] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক —

"যুগ হতে যুগ সমাজসম্পদ
লুটিয়ে নিয়েছে ওরা,
সৃষ্টি করেছে সারা পৃথিবীতে
হাহাকার আর হাহাকার,
বেকারি সর্বহারা —"

পাকুয়াহাটের বিনয় বোস কবিতা সৃজনের সঙ্গে আছেন বহুদিন। কোজাগরী সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তিনি তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কবিতার পথে তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়ান। তাঁর 'ভাস্কর্য'[৮] কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবিতা-রচনার সুপ্ত চেতনা বিন্যস্ত হয়েছে —

"স্বল্প পরিভাষার গুটিকয় শব্দ; কালজয়ী
বর্ণমালায় গেঁথে বৈচিত্র্যের ভেতর চলতে চলতে
এই শৈশব শৈবাল ছেঁড়া কবিতা কখন তৈরি হয়েছে
বুঝতে পারিনি।"

বিষ্ণুপদ মণ্ডল একজন প্রখ্যাত ছড়াকার। গাজোলের শঙ্করপুরে তাঁর বাড়ি। 'যাদুসোনা' নামে একটি ছড়াপত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর 'শীতবুড়ি'[৯] ছড়ার চারটি চরণ —

"দিনের বেলা শীতবুড়িটা ঘোমটা দিয়ে ঘোরে
রাতের বেলা ঘোমটা খুলে হাজির সবার দোরে,
ছোট্ট খোকা ছোট্ট খুকি খবর গেছে জেনে
তাইতো দাদু-দিদুর পাশে ঘুমোয় কাঁথা টেনে।"

গাজোলের সুকান্তপল্লীর নরহরি দাস সাক্ষরতা বিষয়ক ছড়ার একটি বই প্রকাশ করেছেন। কবিতাও লেখেন তিনি। তাঁর 'সমস্যা'[১০] কবিতার কয়েকটি চরণ —

"বে-নজির ধরিত্রীর কোলে
সেকেন্ডে শতাধিক শিশু,
পঙ্গু পত্র-পুষ্পহীন কাষ্ঠবৎ!
খরস্রোতা নদীর বুকে দুধ নেই,"

সুশান্ত চক্রবর্তী ছড়া লেখায় বেশ দক্ষ। থাকেন গাজোলের শিক্ষকপল্লীতে। তাঁর 'আজব শহর'[১১] ছড়ার প্রথম দুটি চরণ —

"সুযোগ পেলে দেখো ঘুরে আজব শহর কলকাতা,
দেখবে যত জানবে যত ঘুরবে তোমার মাথা।"

আইহোর প্রমোদবন্ধু চক্রবর্তী কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতায় আধুনিকতার যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাঁর 'ইকো'[১২] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক এখানে উদ্ধার করা হলো —

"প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন সূর্য
যৌবনের উচ্ছ্বসিত লাস্য
অবাধ্য কামনা মনের
ম্লান হল শূন্য রিক্ত
হতাশায় — দেহের দহন।"

নয়াপাড়ার নিমাই চক্রবর্তী সঙ্গীত রচনার পাশাপাশি কবিতাও লেখেন। তাঁর 'বন্দিনী'[১৩] কবিতার দ্বিতীয় স্তবক —

"পোশাক-ঢাকা দারিদ্র উঁকি দেয়
আনমনা যুবতীর অন্তর্বাসের মতো
তবু বই দেখে নাক সিঁটকে 'মাউস'-এ আঙুল রাখা।"

শিক্ষকপল্লীর অসীমকুমার লাহিড়ী অত্যন্ত দক্ষ কবি ও ছড়াকার। তাঁর 'শিশুর দশা'[১৪] ছড়ার শেষ চারটি চরণে আধুনিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিণাম ব্যক্ত হয়েছে —

"ভোর চারটেয় উঠবে শিশু শুতে যাবে রাত বারোটায়,
নইলে শিশুর প্রতিভাটার সুষ্ঠু বিকাশ করাই যে দায়।
খোঁজাখুঁজির দারুণ ঠ্যালায় শিশুর দশা যিশুর মতো,
শৈশবই তার হারিয়ে গেল হায়রে শিশু ভাগ্যহত!"

গাজোলের নেতাজি সুভাষপল্লীর গৌড়মাধব সিংহ ছড়া-কবিতায় বেশ হাত পাকিয়েছেন। ভিন জেলার সাহিত্য-পত্রিকাতেও তাঁর ছড়া-কবিতা ছাপানো হয়। তাঁর একটি ছড়ার কয়েকটি চরণ —

"পুজো এল, পুজো এল চারিদিকে হল্লা
খেতে মজা পুজোতেই মিহিদানা-গোল্লা।

....

পকেট গড়ের মাঠ, খান বাবু হেঁচকি
গিন্নির গালে হাত খালি ভাতের ডেচকি।

(পুজোর ধারাপাত)[১৫]

বামনগোলার ভূপেন্দ্রনাথ বর্মনের ৩৫ বছর আগে লেখা কবিতা এখনও আধুনিক। সাবলীল গদ্যের বাঁধনে তিনি কবিতার চরণের বিনুনি করেছেন। তাঁর 'কেন এমন হলো'[১৬] কবিতার কয়েকটি ছত্রে এর পরিচয় মিলবে—

"পূর্ণিমার চাঁদের মিতালি
দিগন্তের বাঁশবনে। ....
এখন শুধু অন্ধকারে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না

বড় ভালো লাগে। ....
আলো আছে, বাতাস আছে, ভ্রমর আছে
তবু অনেক কুঁড়ি অকালেই ঝরে যায়-
খোঁজ রাখে না কেউ।"

টাঙন অববাহিকার মহিলা কবিদের মধ্যে লিপি সরকার, রেণুকা পাণ্ডে, সুতপা পাণ্ডে, শ্রুতি মুখোপাধ্যায়, ভাস্বতী দাস, আশা প্রসাদ ও মৌটুসী মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। মৌটুসী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র-যুব উৎসবে (২০০৭) স্বরচিত কবিতা প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। বেশির ভাগই তাঁর গদ্যকবিতা। তাঁর লেখা ভাষাদিবসকেন্দ্রিক একটি কবিতার শেষ চারটি চরণ—

দিন-রাত্তির মিশ্র শব্দ মগজে পুরে
মাতৃভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি বছর ঘুরে!
বিশ্বায়নের স্বপ্নশাবক রাখছি পুষে,
একটা দিনই গর্বে বলছি — আজ একুশে!

(আজ একুশে)[১৭]

টাঙন নদীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন অমূল্যকুমার সরকার (টাঙনের অঙ্গনে)[১৮], তৃপ্তি শিকদার (টাঙন)[১৯], ত্রিপিসা সিং (টাঙন নদী)[২০], তপতী চক্রবর্তী (অহংকারী টাঙন)[২১] প্রমুখ। নালাগোলার অরুণকান্তি বালার কবিতার হাত পাকা। তাঁর 'মদনাবর্তী' শীর্ষক কবিতা বেশ জনপ্রিয়। সত্তরের দশকে

অধ্যাত্মদর্শন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়ক প্রবন্ধের পাশাপাশি কয়েকটি কবিতা লিখেছেন গাজোলের ডা.শ্যামনাথ ভার্মা।

পাকুয়াহাটের ফিরোজ সরকার মুন্না, রাজ্যেশ্বর বিশ্বাস, নালাগোলার পরিমল সরকার, চন্দ্রশেখর চৌবে, কাটিকান্দরের আনেসুর রহমান, মাহিনগরের বীরেশ চক্রবর্তী, হবিবপুরের কল্যাণ বর্মন, বারো মাইলের অবনীভূষণ মণ্ডল, গাজোলের বনমালী বর্মন, নির্মলেন্দু শাখারু, আহোড়ার জীবনকুমার সরকার প্রমুখ কবিতা-ছড়া লেখেন।

২) গান :

একসময় টাঙন অববাহিকার অনেক গান মৌখিক আকারে সজীব থাকত। আজ সেগুলির অধিকাংশই চর্চার অভাবে অবলুপ্ত। তবু স্বরচিত লোকগানের ডালি সাজিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন কতিপয় কবিয়াল। খুব কম হলেও আধুনিক গান, ভক্তিগীতি, দেশাত্মবোধক গান, গণসঙ্গীত ও ছড়াগান রচয়িতার বাস এখানে। এইসব গীতিকারের বেশির ভাগই অপেশাদার।

গাজোলের শালুকার সতীশ সরকার সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর প্রচুর গান লিখেছেন। নিজে সুর করে সেসব গান পরিবেশনও করেন। গাজোলে কলেজ হওয়ার পর তিনি যে-গানটি রচনা করেছেন তার দ্বিতীয় অন্তরা —

“আনন্দিত গাজোলবাসী
মুখে সবার উজল হাসি

বেজায় খুশি আদিবাসী
আরও জনগণে।
গাজোল কলেজ স্বপ্নের কলেজ
স্বপ্নপূরণ এতদিনে।"[২২]

সুগায়ক নিমাই চক্রবর্তী কবিতার সঙ্গে গানও লেখেন। তাঁর গানের সুরকার তিনিই। তাঁর লেখা লোক-আঙ্গিকের একটি গানের স্থায়ী অংশ —

"ত্রিলোচন জগৎপতি (আমরা) প্রণাম জানাই তোমাকে,
দয়া করো ওহে প্রভু পড়েছি বিপাকে।
তোমার ষাঁড়ের দলে খাচ্ছে সরষা
তুমি শুনছ বসে নানান কিস্‌সা,
তোমার ডাকলে সাড়া না-পাই আমরা
মর্ত্য থেকে আকাশে।"[২৩]

মদনাবতীর শিবু পুজর লেখেন লোকগান। তাঁর একটি গানের অংশ —

"ঘুর ঘুর হে আরানা মহিষপাড়া
দুবল ঘাসে চরল গেলে
সরবত পানি পিয়েল গেলে রে।"[২৪]

গাজোলের কাটিকান্দরের মদনমোহন মজুমদার, শংকরপুরের অনন্ত মালাকার, চাকনগরের অমূল্য হালদার (সরকার) প্রমুখ বোলকাটাকাটি বা

কবিগান লেখেন। নিজেরা সুরদিয়ে সেসব গান পরিবেশন করেন। অমূল্যবাবুর একটি গানের স্থায়ী ও প্রথম অন্তরা —

"ভজন-সাধন করবি যদি ওরে মন
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা দেহক্ষেত্রে কর স্মরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ করে সারথী, যুদ্ধে হবে অগ্রগতি
গুরুপদে রেখে মতি, ধনুর্বাণ কর ধারণ।
প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ দখল করো হৃত রাজ্য
ভোগ করিবে সব ঐশ্বর্য শত্রুদের করো নিধন ॥"[২৫]

সরকারপাড়ার আব্দুল ওয়াহাবের লেখা কয়েকটি আধুনিক গানে সুরারোপ করে রেকর্ড করেছেন শিক্ষকপল্লীর শিল্পী জয়া চক্রবর্তী। আব্দুল ওয়াহাবের "এখনও জীবনসন্ধ্যা আমার আসেনি জীবন ঘিরে" গানটি বেশ জনপ্রিয়।

শিক্ষকপল্লীর বনমালী বর্মন একজন প্রতিষ্ঠিত গম্ভীরা-গীতিকার। তাঁর লেখা গান আকাশবাণী ও দূরদর্শনে পরিবেশিত হয়। পরিবেশ-সচেতনতা বিষয়ক একটি গানের সামান্য অংশ —

"যে মাটি মানুষকে দিলে খাদ্য বস্ত্র বিস্তার
বিষ মিশাইয়া সে মাটিকে দিলে নাকো নিস্তার।
নানা হে।"[২৬]

বামনগোলার মণ্টু সাহা খুটাদহের শুকলাল মধু, নবাবনগরের অমূল্যকুমার সরকার, নালাগোলার সুনীল অধিকারী ও সুমন্ত্র কীর্তনীয়া গান রচনার দক্ষ। সুমন্ত্রবাবুর লেখা 'তত্ত্ববীণা' একটি সঙ্গীতগ্রন্থ। শিক্ষকপল্লীর প্রশান্ত সরকার কয়েকটি বাউলগান রচনা করেছেন। গাজোলের ব্লকপাড়ার গৌরাঙ্গদেব ভার্মা একগুচ্ছ ছড়া ও কবিতার পাশাপাশি অজস্র গানও রচনা করেছেন। কলকাতার বিশিষ্ট লেখকদের সঙ্গে তাঁর ছড়া ও কবিতার রেকর্ড আছে।

টাঙন অববাহিকার সঙ্গীতময় জনপদে সাহিত্যসৃজনের যে-ঐকতান সেখানে গীতিকারদের অনবদ্য ভূমিকা স্বীকার করতেই হবে।

তথ্যসূত্র :

১. আঞ্চলিক ভাষার কবিতা ২০০২, সম্পাদনা: মধুমঙ্গল বিশ্বাস। দৌড় প্রকাশনা, মিলনপল্লী, উত্তর চব্বিশ পরগনা। পৃষ্ঠা-৭৮

২. কোজাগরী ২০০৯, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৭

৩. সাহিত্যসঙ্গ, নবম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-খ৪

৪. দীপশিখা, শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৪, নালাগোলা ৩৮

৫. কোজাগরী, জানুয়ারি ২০০৪, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৩

৬. তরঙ্গ, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১১

৭. তরঙ্গ, জানুয়ারি ২০০৩, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ১২

৮. ছুটি সাহিত্যবাসর ২০০৮, মালদহ থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৫৬

৯. যাদুসোনা, চতুর্থবর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-০৪
১০. উত্তরণ সাহিত্য ১৯৯৮, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-১২
১১. ফজলি, শারদ সংখ্যা ১৪০৯, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২১
১২. অর্ঘ্য, বুলবুলচণ্ডী থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২৫
১৩. অর্ঘ্য, (চন্দ্রাবতী সাহা বিদ্যাপীঠের পত্রিকা) ২য় সংখ্যা, চাঁদাহার থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২০
১৪. ফজলি, গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪০৮, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-১৭
১৫. ফজলি, শারদ সংখ্যা ১৪০৭, গাজোল থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা-৪৬
১৬. টাঙনের ঢেউ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মার্চ ১৯৭৪, পাকুয়াহাট থেকে প্রকাশিত পৃষ্ঠা- ৪-৫
১৭. উজ্জ্বলনীলমণি, সংখ্যা ১, বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা-১৭
১৮-২১. কবি লিখিত পাণ্ডুলিপি
২২. গাজোল মহাবিদ্যালয় পত্রিকা, ২য় সংখ্যা ২০০৮-০৯ পৃষ্ঠা-৩৯
২৩ গীতিকার লিখিত পাণ্ডুলিপি
২৪. গীতিকারের কাছে শোনা
২৫. একালের ধৃতি, ৪র্থ সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৫, কলকাতা-২৪
সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত পৃষ্ঠা-৯২
২৬. গাজোলের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'রুদ্রবীণা' -এর সৌজন্যে প্রাপ্ত